ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৫ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৪২৫

চিলেকোঠার সেপাই উপন্যাসে লৌকিকজীবন

*ড. মোহাম্মদ শামসুল আলম

সারসংক্ষেপঃ আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *চিলেকোঠার সেপাই* উপন্যাসটিতে প্রধানত দুটি বিষয়বস্তুর প্রবাহ লক্ষ্য করা যায়। এর একটি হলো ১৯৬৩ সালের গণঅভ্যুত্থানের ঘটনা সম্বলিত চিত্র। আর অপরটি হলো বিস্তৃত গ্রামীণ লৌকিক জীবনধারার পটভূমি। যা লোকবিশ্বাসের দৃঢ়তায় সরাসরি সম্পৃক্ত। ঔপন্যাসিক নগর ও গ্রামের জীবনপ্রবাহকে লৌকিক জীবন ধারায় অখণ্ড তাৎপর্যে রূপায়িত করেছেন। লোকায়ত ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং জীবনের প্রতি দায়বদ্ধতায় ইলিয়াস ছিলেন উপন্যাস সাহিত্যে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন নির্মাতা। তারই ব্যাপ্তি ঘটেছে উপন্যাসটির লৌকিক জীবন ভাবনায়। গ্রন্থটিতে বাস্তবজীবনার্থের নৈপুণ্যে গ্রামীণ লোকজ উপাদানসহ নানা চিত্র শৈল্পিক অভিপ্সায় উপন্যাসের মর্যাদা পেয়েছে। তিনি সময়-সমাজ-সভ্যতা, ইতিহাস, বিশ্বাস ও ঐতিহ্যকে জ্ঞানলব্ধ ছকের মাধ্যমে উপন্যাসে নুতন শিল্পমাত্রায় উন্নীত করেছেন। লেখক তাঁর এই উপন্যাসে বগুড়া জেলা ও তৎসলগ্ন গ্রামীণ জীবন, সেখানকার মাটি ও মানুষের বিশ্বাস-সংস্কার, কিংবদন্তি, আলুরখেত, পাখ-পাখালি, করতোয়া নদী, মাজার প্রভৃতি দৃশ্যপটের লৌকিক বর্ণনা নিখুঁত শিল্পায়ণে রূপ দিয়েছেন। সে কারণেই বলা যায়, *চিলেকোঠার সেপাই* গ্রামীণ মধ্যবিত্তের দোদুল্যমান জীবনের রূপায়িত আলেখ্য।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭) বাংলা কথাসাহিত্যে একটি স্মরণীয় নাম। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক। বাংলা কথাসাহিত্যের পটভূমিতে অবতরণ করে তিনি সৃষ্টি করেছেন জীবনবাদী ধারার এক স্বতন্ত্র পথ। তিনি ছিলেন উপন্যাস সাহিত্যে তাঁর জীবনদর্শনের রূপ-চিত্রণে অভিনবত্ব সৃষ্টিকারী নির্মতা। বাঙালির আবেগদীপ্ত প্রত্যাশা-প্রাপ্তির অন্তর্ভেদী সত্যকে সম্পূর্ণতা প্রদানের ঐকান্তিকতায় তিনি ঋদ্ধ। বিশেষ করে গ্রামীণ মানুষের জীবন চিত্রণে তিনি ছিলেন খড়গহস্ত। ভিন্ন ভিন্ন জীবন ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা, জমির জালিয়াতি, সুদখোর মহাজনের অত্যাচার, বর্গাচাষীর অসহায় আর্তনাদ, পরজীবী টাউট আর জোতদারদের জীবন যাপন, গরীবদের মধ্যে সংস্কার ও লোকবিশ্বাসের আধিক্য, ধর্মের যোগান সবই নিগুঢ়ভাবে সম্পৃক্ত হয়েছে তার উপন্যাসে।[১] *'চিলে কোঠার সেপাই'* (১৯৮৬) উপন্যাসটিতে বাঙালি জীবনের সমগ্র রূপবৈচিত্র্য মৌল অবয়বে স্বতন্ত্রভাবে উন্মোচিত হয়েছে। উপন্যাস জীবন ঘনিষ্ঠ শিল্প, অন্তর-বাহির সমেত জীবনের বহুমাত্রিকতার রূপায়ণ তার স্বধর্ম। সে জন্যই সময়-সমাজ ও জীবনের বহুমুখী সত্য সেখানে প্রতিফলিত হতে বাধ্য।[২] আমরা লেখকের উপন্যাসে মানবজীবনের এসব সত্যের নিগূঢ় সম্পৃক্তির প্রমাণ দেখতে পাই। কালসচেতন ও কর্মনিষ্ঠ মানুষ ইলিয়াস উপন্যাসের বিবর্তনশীল ইতিহাস-ঐতিহ্যের মূল্যবোধের সঙ্গে একীভূত করে সমাজের ভিত রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। গ্রন্থাগারে প্রকাশিত লেখকের উল্লিখিত এই উপন্যাস নিয়ে সমাজ-সমকাল ও সংস্কৃতিকে প্রাধান্য পাবে। দ্যোতনা নির্ভর সৃজনশীলতার পাশাপাশি গ্রামীণ লৌকিক জীবন কীভাবে সম্পৃক্ত হয়েছে সে বিষয়টির বর্ণনা বর্ণিত আলোচনায় অন্বিষ্ট হবে। যেহেতু, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *চিলে কোঠার সেপাই* উপন্যাসে লৌকিক জীবন

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নওগাঁ সরকারি কলেজ, নওগাঁ

আলোচ্য প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়, সেহেতু লৌকিকজীবন উপন্যাসের বিষয়বস্তুর আলোকে বিশ্লেষিত হবে।

লেখক আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের যথার্থ প্রতিভার প্রকাশ ঘটেছে উপন্যাস সাহিত্যে। তাঁর প্রথম উপন্যাস *চিলেকোঠার সেপাই*-এর বিস্তৃত পটভূমি গ্রামীণ লৌকিক জীবনধারার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বিশেষ করে সমকালীন সমাজের রাজনৈতিক বাস্তবতা ও লোকজীবন একইসঙ্গে একীভূত হয়েছে। সাহিত্য সমালোচক রফিকউল্লাহ খান এ প্রসঙ্গে বলেছেন- 'সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নব্য ঔপনিবেশ কবলিত পূর্ব-বাংলার নাগরিক ও গ্রামীণ জীবনের বিস্তৃত পরিসর *চিলেকোঠার সেপাই* উপন্যাসকে এপিক চরিত্রধর্মে উন্নীত করেছে'।[৩] ঔপন্যাসিক নগর ও গ্রামের জীবনপ্রবাহকে লৌকিক জীবন ধারায় অখণ্ড তাৎপর্যে রূপায়িত করেছেন। লোকায়ত ইতিহাস-ঐতিহ্যে এবং জীবনের প্রতি দায়বদ্ধতায় ইলিয়াস ছিলেন উপন্যাস সাহিত্যে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন নির্মাতা। এরই দৃশ্যাবলি ব্যাপ্তি পেয়েছে এভাবে-

> ভোরবেলার স্বপ্ন নাকি সত্যিই ঠিক ফলে, বাপ তার সত্যি সত্যিই মরে গেল কি না কে জানে? একটু আগে দেখা স্বপ্ন, সহজে কি ছাড়তে চায় ?... তবে স্বপ্নে নিজের কাউকে মরতে দেখলে অন্য লোক মরে।[৪]

এমন কথা লোকিকজীবনে সবাই জানেন ও বিশ্বাস করেন। নিজের বাড়ির লোককে স্বপ্নে মরতে দেখলে যে সাধারণত অপরাপর কোনো লোকের মৃত্যু হয়, এমন বিশ্বাস ও ধ্যান ধারণা লোকসমাজের অনেকেই জানেন ও মানেন। এ উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র ওসমানই দেখেছিল এ জাতীয় একটি স্বপ্ন।

আবহমান বাংলায় দেখা যায় স্বপ্নে বিছানায় প্রসাব করার চিত্র; আর তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র উপায় হলো পানি পড়া খাওয়া। 'বিছানায় পেশাব বন্ধ করার জন্য মা তার কম চেষ্টা করে নি। কতো তাবিজ, কতো পানি পড়া, শেষ পর্যন্ত সারলো রহমতউল্লার বাড়ির ঠিকা-ঝি মজির মায়ের জোগাড় করা ফরিদাবাদ মাদ্রাসার মৌলবি সাহেবের পানি পড়া খেয়ে'।[৫] এরপরও কিছুদিন ভালো থাকার পর আবারো বিছানায় প্রসাব করেছিল উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র খিজির। খিজিরের মা এমতাবস্থায় নানা স্থানে ছুটাছুটি করার পর মহাজন রহমতউল্লার বাড়ির কাজের লোক 'মাতারি নিয়ে আসে বড় মৌলবির পানিপড়া। এই মাতারির নিয়ে আসা মৌলবির পানি পড়াতেই খিজিরের বিছানায় পেচ্ছাব করা বন্ধ হয়'।[৬] উপন্যাস পাঠে জানা যায় যে, এরপর আর খিজির বিছানায় প্রসাব করে নি। এ ধরনের লোকবিশ্বাস জনজীবনে এখনও বহমান আছে। গ্রামের মানুষরা যে সহজেই কোন কিছু বিশ্বাস পোষণ করেন তারই চিত্র এখানে প্রতিফলিত হয়েছে। বিশ্বাস প্রবণতা হলো গ্রামীণ লৌকিক জীবনে বসবাসকারী মানুষের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতেই দেখা যায়, গ্রামে যখন জ্বীন-ভূত বেশি বাড়াবাড়ি শুরু করে তখন লোকসমাজ এ থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য মিলাদ পড়িয়ে নেন। 'তোতায় কয় গ্রামের মইদ্যে মহাজনের কইয়া মিলাদ পড়াতে হইবো। জ্বিনে বহুত জালায়'।[৭] এভাবে মিলাদ পড়িয়ে জ্বীনকে তাড়িত করা হতো। লোকজীবনে এমন বিশ্বাসের আবেদন এখনো সমান অবস্থায় অটুটভাবে ক্রিয়াশীল রয়েছে।

চিলেকোঠার সেপাই উপন্যাসের অন্যতম প্রভাবশালী চরিত্র হলো মহাজন রহমতউল্লা। তার ১৩-১৪ বছরে একমাত্র সন্তান আওলাদ হোসেন। আওলাদের মৃত্যু হলে তাকে মুসলিম ধর্মের বিধান অনুযায়ী কবরে সমায়িত করার পূর্বে শরিয়তের তরিকা মোতাবেক 'ধোয়াবার জন্য নতুন একটা বাঙলা সাবান কেনা হয়। কর্পুর, আতর, গোলাপজল, আগরবাতি'সহ[৮] ধর্মীয় বিধান মোতাবেক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদিত হয়। মহাজন রহমত উল্লার স্ত্রী তার স্বামীর কর্মকাণ্ড নিয়ে বড়ই উদ্বিগ্ন ছিল। কারণ সে বড়ই চতুর ও খলচরিত্রের মানুষ। তবে দুনিয়ায় যত ধর্মীয় কাজ আছে তার ধারে-কাছে সে কোনদিন যাবেই না। শুধু তাই নয়, যত রকম অন্যায় কাজ আছে তা সে করতে আনন্দ পায়, বিশেষ করে মানুষকে ঠকানো বা প্রতারণা করা। 'হাবিয়া দোযখের মইদ্যেও তোমার জায়গা হইবো না আওলাদের বাপ! কী খাওয়া দিচ্ছিলা কওতো? তোমার আখেরাত নাই'।[৯] স্বামীর ক্রিয়াকর্মে বিবিসাহেবা এভাবেই সংকটে সন্দিহান ছিলেন। এ ধরনের লোকেরা হয় আল্লাহর নাফরমান বান্দা। আর সেই লোকবিশ্বাসের জন্যই কাঁদতেন বিবি সাহেবা। উপন্যাসে মৃত ব্যক্তির অযাচিত ডাকে রাতের অন্ধকারে উপস্থিত হবার দৃশ্যও লৌকিক জীবনে বিশ্বস্ততা এনেছে। 'বললে লোক বিশ্বাস করবে না, এখনো মাঝে মাঝে অনেক রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গেলে নিমঘুম নিমজাগরণে খিজির বুঝতে পারে যে মোটামোটা একটি হাত তাকে ঠেলে এক পাশে সরিয়ে বুকে চাপ দিচ্ছে। মা-এই সম্বোধন করার জন্য তার শ্লেষ্মা জমা ও সিগ্রেটের ধোয়ায় কালিমাখা গলায় ঝাপসা ধ্বনিপুঞ্জ জমা হয়। তবে এই হাল বেশিক্ষণ থাকে না। জুম্মনের মায়ের সশব্দে পাশ ফেরার আওয়াজে মা এবং অন্যজন হাওয়া হয়ে যায়'।[১০] মা মারা যাবার পরও খিজির রাতের অন্ধকারে তার মাকে এভাবেই দেখতে পেত। মোটকথা মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষগুলো Basicall নার্সিসিস্ট। তারা অতীতকে নিয়েই থাকতে ভালবাসে।[১১] সেজন্য এজাতীয় ভাবনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র খিজির মুগ্ধ হয়েছে।

ইলিয়াসের *চিলেকোঠার সেপাই* উপন্যাসে গ্রামীণ লৌকিক জীবনের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি জীবন ধারার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। 'তোমার দাদা বড় শক্ত মানুষ ছিল গো, ছেলেপেলেকে ইদারার তোলা পানি ছাড়া গোসল করবার দেয় নাই। বড় মিয়া বিছানা ছাড়ছে রাত থাকতে, বেলা ওঠার আগে বাড়ির ছেলেপিলে সব কয়টাক উঠায়া দিচ্চে। নামাজ পড়া লাগছে বাড়ির সব মানুষেক, জায়গির, কৃষাণ চাকরপাট সোগলে নামাজ পড়ছে তার বাড়িত'।[১২] গ্রামীণ প্রতাপশালী চরিত্র খয়বার গাজী নিজ বংশগোত্রীয় আনোয়ারকে এভাবে তাদের পূর্ব সংস্কৃতি ও গ্রামীণ ঐতিহ্যের কথা বলেছিল। আবার আনোয়ারদের বাড়ির কামলা পাইট নাদু পরামানিকও রসিকতার সুরে বলেছিল-

> তাদের পারিবারিক ঘটনা নিন্দের মধ্যে খাব দেখবানাগাছি ! কি? না, পাতারের মধ্যে গরু খুঁজ্যা বেড়াই। ধলা বকনাখান গো, বড় মিয়ার খুব হাউসের বকনা, সেই বকনাক আর পাইনা। ঘড়ি বাদ দেখি, পাতারের উত্তরে মস্ত বড়ো পিপুল গাছটার তলাত খাড়া হইয়া আছি, ঝড় নাই, পানি নাই, মোটা একখান পিপুলের ডাল ভ্যাঙা পড়লো হামার পিঠোত। ইটা কি বাবা? চেতন পায়া দেখি কোটে পাতার? কোটে পিপুলের ডাল? বড় মিয়ার বোলআলা খড়মখান হামার পিঠের উপর'।[১৩]

বংশের গৌরব প্রচার ও প্রকাশ করা লোকজীবনে এক ধরনের সংস্কৃতিরই পরিচয়। এখানেও সেই গ্রামীণ সংস্কৃতির কথা মেসেজ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। তা আজও যেমন প্রাচীনকালেও ছিল তেমনি, এবং সেইসঙ্গে সমাজ-সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশ যেন সমানভাবে ক্রিয়াশীল হয়ে আছে।[১৪] আবহমান গ্রাম বাংলার গার্হস্থ্য পরিবারের ঐতিহ্য হলো কৃষিকাজ ও এর প্রয়োজনীয় উপকরণের যথাযথ ব্যবহার করা। এরই চিত্র চিত্রিত হয়েছে উপন্যাসের আঠারোতম অধ্যায়ে। 'সেই রাত্রেই নতুন শেকল তালা ভেঙ্গে চোর ঢুকলো জ্যাঠার ঘরে, গাই নিলো, বকনাটা নিলো, বলদ নিলো, যাবার সময় উপরি নিলো শেকল ও তালা'।[১৫] এভাবেই গ্রামীণ কৃষক পরিবারে যে গরু চোরের আনাগোনা হয় এবং সেইসঙ্গে চুরি হয় গরু। চুরির কথা শুনলে সাধারণত সেটি থেকে রক্ষার জন্য গ্রামের মানুষরা যে পাশে এসে দাঁড়ায় ও প্রয়োজনীয় সাহায্য করে থাকে তা যেন গ্রামীণ লৌকিক জীবনের একটি স্বভাব ও লোকধর্ম। গ্রামের বাইরে থাকা লোকজন চুরি হওয়ার ঘটনা সম্বলিত বিবরণ জানতে চাইলে গ্রামের গৃহস্থ কাবেজ জানায়- 'ঐ আত্রে হামি লিজে শুত্যা থাকলাম গোলের মদ্যে, ছোট এ্যানা গোল হামার, তারই মদ্যে হাতপাও মেল্যা দেই কোটে? আর মশা; হায়রে মশাতো মশা! মশার কামড় খাতে খাতে তামান আত দুই চোখের পাতা এক করবার পারি নাই'।[১৬] গ্রামের লোকজন কাবেজের একথা সহজে বিশ্বাস না করলে পুনরায় সে বলেছিল-'না চাচা মিয়া, ঘুম লয়, অরা কি য্যান ছিট্যা দেয়। মন্তর পড়্যা ঘরের মদ্যে বালু ছিটাচ্ছে, হামি চেতনই প্যালাম না ! দিশা পালে এক শালাক জান লিয়া যাবার দেই? শালার ব্যাটা শালারা।'[১৭] কাবেজের এমন কথা শুনার পরপরই লোকসমাজ একবাক্যে সেকথা বিশ্বাস করে নেয়। 'লোকবিশ্বাস মানুষের আচার-আচরণ দ্বারা সমর্থিত হয়ে জীবন যাত্রার পথে স্থায়ী ও প্রথাগত স্বীকৃতি লাভ করে থাকে। ক্রমে এগুলো মনের গভীরে স্থান পায়'।[১৮] ইলিয়াসের *চিলেকোঠার সেপাই* উপন্যাসে গ্রাম-বাংলার লোকায়ত জীবনের দৃশ্যাবালি এভাবে বিম্বিত হয়ে উঠেছে।

গ্রাম বাংলায় অবস্থিত পল্লি মানুষের মৃত্যুকালীন জীবন চিত্রের ব্যবহার *চিলোকোঠার সেপাই* উপন্যাসকে সত্যতা প্রদান করেছে। উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র বড় মিয়ার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে অপরাপর পাত্র-পাত্রীরা মৃত্যুর কারণ হিসেবে জানিয়েছে যে, 'তোমার নাথি হামার পিঠোতেই থাকলো গো বড় মিয়া, তুমি কোটে চল্যা গেলা'।[১৯] লোকসমাজ মৃত্যুর কারণ হিসেবে জানিয়েছে যে, বড়মিয়া মৃত্যুর পূর্বে তার বাড়ির কামলা পাইট নাদুকে পা দিয়ে লাথি মেরেছিল। পা দিয়ে লাথি মারার কারণে অন্যায় কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবেই তার মৃত্যু হয়েছিল। সে জাতীয় একটি ভাবনার আবেদন প্রাকশিত হয়েছিল মৃতুকালীন সময়ে উপস্থিত লোকসমাজ কর্তৃক আলোচনায়। উপন্যাসে দেখানো হয়েছে যে, অপর মানুষের হাতে মার খাবার পর বাড়িতে এলে, বাড়ির লোকজন যে আবার তাকেই গালিগালাজ ও ভর্ৎসনা করে তারই বিবরণ বিম্বিত হয়েছে। 'লাথি গুড়ি যা খাবার চাও তাড়াতাড়ি খায়া আসো। কুনদিন যায়া শুনব্যা গাজীর বেটার দুটা ঠ্যাংই ভাঙা দিছে, তখন নাথি দিবো কি দিয়া'।[২০] অপর মানুষ নিজের লোককে মারলে আবার নিজের লোকরা তাকেই গালিগালাজ করে। এমন বিশ্বাসের চিত্র আজো অক্ষুণ্ন রয়েছে এই উপন্যাসে। গ্রামের সহজ-সরল মানুষগুলো বিত্তবান সামন্ত প্রভুদের নিকট কিছুই চান না। তারা চায় শুধুমাত্র সাহস-শক্তি ও

লোকবল। 'আপনি যদি গায়ের মানুষের সাথে এ্যানা কথাবার্তা কন, সাথে সাথে থাকেন তা হলে আফসার গাজী এতো সাহস পায় না। গরীব-গবরা, চাষা-ভুষা মানুষ, মুরুখ্য মানুষ, বুঝলেন না? আপনে থাকলে হামরা হিরদয়ে বল পাই ভাইজান'।[২১] সমাজের বিত্তবান, প্রভাবশালী ব্যক্তির আশ্বাস পেলে গ্রামের সাধারণ দরিদ্র মানুষগুলো যে বলশক্তি সঞ্চার করে, লোকবিশ্বাসের সে চিত্র উপন্যাসটিতে গোচরীভূত হয়েছে। ইলিয়াস বৃহৎ সময়ের পরিসরে গ্রামীণ লৌকিক জীবনের বাস্তবতা ও গ্রামের মানুষের বিশ্বাসকে[২২] উপন্যাসে চিত্রিত করেছেন। লৌকিক জীবনে লোকবিশ্বাসের চিত্র উপন্যাসের জনৈক চরিত্র কামরুদ্দিনের কথায় গভীরভাবে স্পষ্টতা পেয়েছে। 'যার নেমক খাই তার উপর টেক্কা মারতে গেলে খোদায় গোস্বা হয়। মগজ পড়ে রোজগার পাতি পইড়া যায়'।[২৩] যার খেয়ে বাঁচা হয়, তার উপর টেক্কা মারা ঠিক নয়। অর্থাৎ নুন খেয়ে নুন হারামি করলে যে অকল্যাণ হয় সে বিশ্বাসটি এখানে চিত্রিত হয়েছে।

লোকজীবনের পারিবারিক জীবনালেখ্যর নানা অনুষঙ্গ *চিলেকোঠার সেপাই* উপন্যাসে ব্যাপ্তি পেয়েছে। সুবিধাবাদী মহাজন রহমতউল্লার আঠালো চোখ লেগে ছিল জুম্মনের মায়ের দিকে। বৈষয়িক জুম্মনের মাও ভবিষ্যতে জুম্মনের কথা চিন্তা করে মহাজনের এমন অভ্যাসটা কাজে লাগায়। কারণ জুম্মনের মা অনাগত ভবিষ্যতের জন্য সবকিছু করতে পারে।[২৪] শেষ পর্যন্ত মহাজনের লালসায় পড়ে গর্ভে ধারণ করেছিল এক অবৈধ সন্তান। 'জুম্মন কুপি জ্বালালেও কালচে আলোয় ছেলের মুখ দেখে জুম্মনের মা জড়ো সড় হয়'।[২৫] অভাবী দারিদ্র্যপীড়িত রমণীরা এভাবেই ছদ্মবেশী মহাজনদের লালসা মেটায়। সন্তানের কল্যাণ কামনায় মায়ের প্রার্থনা। কল্যাণের জন্যই জুম্মনের মা অন্যায়ের নিকট মাথা পেতেছিল। শাশ্বত জননীর মহিমা নিয়েই স্নেহ বাৎসল্যে বাচতে চায় বাঙালি নারীসমাজ। এমন লোকবিশ্বাসের প্রতি প্রগাঢ় সহানুভূতি রয়েছে জুম্মনের মায়ের। বিপদের সময় মানুষ মানুষের পাশে দাঁড়ায় এটিই সমাজের রীতি। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, সুতরাং সমাজ ছাড়া মানুষের বেঁচে থাকা অসার। এজন্যই সমাজ ও দেশের মানুষ হঠাৎ বিপদে পড়লে সাধ্যমতো সমাজের সকল স্তরের মানুষ নানা মনোভাব নিয়ে পাশে এসে দাঁড়ায়। এ উপন্যাসেও দেখা গেছে মধ্যবিত্ত পরিবারের রমণী আনোয়ারের মা বিপদগ্রস্ত মানুষদের আশ্রয় দিয়েছে। 'বিপদে আপদে মানুষকে সাহায্য করবে না কেন ? পঞ্চাশ সালের রায়টে এই বাড়িতে আটটা হিন্দু ফ্যামিলি পুরো একমাস ছিলো জানিস ? তোরা তখন ছোটো, কতো ঝুঁকি নিয়ে আমরা তাদের থাকতে দিয়েছিলাম'।[২৬] লোকসমাজ বিশ্বাস পোষণ করে যে, অন্তত আর কিছু না হোক বিপদের সময় আশ্রয় মিলবেই। আশ্রয়দান করা মানুষের লৌকিক ধর্ম। এভাবেই উপন্যাসে লোকসাহায্যের প্রকৃত বর্ণনা ও চিত্র বিধৃত হয়েছে।

লোকবিশ্বাস ও সংস্কারের চিত্র অশিক্ষিত ও শিক্ষিত সবার মধ্যেই যে কমবেশি প্রভাব ফেলে। তবে গ্রাম-বাংলায় তা অহরহ প্রভাব বিস্তার করে। ইংলিশ Folk belief এর অর্থ লোকবিশ্বাস।[২৭] এই লোকবিশ্বাসগুলো মানুষের আচার-আচরণ দ্বারা স্বীকৃতি পেয়ে জীবনযাত্রার পথে স্থায়ী সমর্থন অর্জন করে। এ জাতীয় বিশ্বাস এর চিত্র আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *চিলেকোঠার সেপাই* উপন্যাসে নানাভাবে বিধৃত হয়েছে। উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র আনোয়ারের চাচা জাহাঙ্গীর ছিল স্কলার ছাত্র। তার মতো স্কলার ছাত্র ইতিহাসে

বিরল। 'হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক কেশব মিত্রের ফেয়ার ওয়েল বক্তৃতা করলো ইংরেজিতে, যারা শুনেছে তারাই বলেছে, মনে হলো বিলাত থাক্যা সদ্য আগত ইংরাজ ভাষণ দিতেছে'।[২৮] ক্লাস নাইনে পড়া ছাত্রের এমন বক্তৃতা শুনে উপস্থিত সুধীমণ্ডলীর অনেকেই তখন কানাকানি বলাবলি শুরু করে বলেছিল-'ঐ বয়সে অতো মেধা ... চেংড়ার সাথে তেনাদের কেউ আছেন। না হলে এই বয়সের চ্যাংড়া এতো বুদ্ধি পায় কোটে ? তেনারা মানে, আরে আগুনের জীব। জীন ! জীন'।[২৯] মুরুব্বিরা এমন অনুমান করেছিল। মুরুব্বিদের অনুমান কি ভুল হতে পারে ? পারে না, অল্প কিছুদিন পরেই দেখা যায়, 'জাহাঙ্গীরকে গ্রামে নিয়ে আসা হলো, তার হাতে পায়ে শেকল পরানো, তার মাথা কামানো, চোখ জোড়া তার অষ্ট্রপ্রহর লাল, মানুষ দেখলে চিৎকার করে, না দেখলেও আকাশের দিকে তাকিয়ে বিকট শব্দ করার উদ্দেশ্যে গালাগালি করে'।[৩০] এভাবেই মুরুব্বিদের কানাকানি বাস্তবে রূপ পায়। কারণ, মানুষের সমস্ত বিশ্বাস ও সংস্কার মানব সমাজের সাধারণ সম্পত্তি।[৩১] অবশেষে এমন পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য জাহাঙ্গীরের ভাই আকবর চিকিৎসার জন্য জাহাঙ্গীরকে আবারও নিয়ে যান পির সাহেবের নিকট। উপন্যাস পাঠে জানা যায়-

> জোনপুরের মৌলবী সাহেবের ভাগ্নে জবরদস্ত পীর সায়েব, নৌকা করে যমুনার শাখা নদী বাঙালি দিয়ে যাচ্ছিলো মুরিদবাড়ি, নাদু পরামানিকের কাছে খবর পেয়ে আনোয়ারের বড় চাচা নিজে গিয়ে নৌকা থামিয়ে পীর সায়েবের হাতে পায়ে ধরে। পীর সায়েব এসে জাহাঙ্গীরের রোগ সনাক্ত করে ফেললো। কলকাতায় কোথায় কোন অজ গাঁয় দাঁড়িয়ে পেচ্ছাব করছিলো, সঙ্গেকার জীন তাই খেপে গিয়ে একটা বদস্বভাব জীনকে তার ওপর আসর করিয়ে দিয়ে নিজে সরে পড়েছে। বদ জীন ঝেড়ে ফেলা পীর সায়েবের কাছে ডাল ভাত। জাহাঙ্গীরকে বেঁধে কয়েকটা আয়াত পড়তে পড়তে ঝাড়ুর বাড়ি মারলে শয়তানটা বাপ বাপ করে পালাবে। কিন্তু পীরসায়েব তা করতে নারাজ; কারণ তাতে ভালো জীন অসন্তুষ্ট হয়। জীন হলো ফেরেস্তাদের মতো, তাকে অসন্তুষ্ট করার ঝুঁকি পীরসায়েব নেয় কি করে?[৩২]

পির সাহেব জানায় মুসলমানের সন্তান হয়ে কম্যুনিস্টদের সঙ্গে মেলামেশা করে ইসলাম পরিপন্থি কাজ করা এবং যেখানে সেখানে দাঁড়িয়ে প্রসাব করার কারণে তার সঙ্গে থাকা জীনটি রাগান্বিত হয়ে জাহাঙ্গীরের এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। পির সাহেবের এ জাতীয় কথায় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন গ্রামীণ লৌকিক জীবনে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। উপন্যাসে দেখা যায়, লোকবিশ্বাস ও সংস্কারের বহুরূপী চিত্র। এগুলো বিশেষভাবে স্থান করে নিয়েছে। লোকসংস্কারের চিত্র হিসেবে দেখা যায় নাদু প্রামাণিকের ছেলে চেংটু ঝোপঝাড় বেষ্টিত অদৃশ্য শক্তি সম্পন্ন বৈরাগীর ভিটায় কোপ দিয়েছিল; বিধায় কোপ দেয়ার ফলশ্রুতিতে তার মৃত্যু হলে লোকসমাজ চেংটুকে নিয়ে আফসোস করে বলেছিল,

> 'চ্যাংড়া মানুষ। মাথা গরম কর‍্যা কোপ মারলো বৈরাগীর ভিটাত। আগুনের জীব বাপু। কোরান-হাদিসে কি মিছা কথা কইছে? জীনের গাওত হাত পড়ছে ! নাদুকে সে সান্ত্বনা দেয়, মন খারাপ কর‍্যা কি করব্যা ? জুম্মার ঘরত শিরনি দিও। টাকা পয়সা না হয় কিছু নিও। চেংটুর মৃত্যুর পিছনে জীনের সক্রিয় ভূমিকা সম্বন্ধে জালাল উদ্দিনও নিশ্চিত, মসজিদে শিরনি দেওয়ার জন্য সে নিজেও কিছু চাঁদা দেওয়ার প্রস্তাব করে'।[৩৩]

বৈরাগীর ভিটায় কোনভাবে যদি কেহ এমন কাজ ভুলবশত করে, তবে তাকে তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত দিতে হয়। এভাবে লোকসংস্কার মানব জীবনে অবস্থান করে নিয়ে দৃঢ় অবস্থায় অটুট রয়েছে। আর কোন শুভ কাজে অলক্ষণ দেখা দিলে সাধারণত অকল্যাণ হয় সে বিশ্বাসও *চিলেকোঠার সেপাই* উপন্যাসের নানা ছত্রে বর্ণিত হয়েছে। 'আজ বিকেল হতে বিবিসায়েব নিজেই তাকে ছুটি দিলো। জুম্মনের মা কি এসব বোঝে না? কাজেকামে যতই স্বচ্ছল হোক শুভ অনুষ্ঠানে অপয়া মেয়ে মানুষ ঘরে থাকলেই কুফা'।[৩৪] মহাজনের বাড়িতে উৎসব অনুষ্ঠান পালনকালে বিবিসাহেব গর্ভবতী জুম্মনের মাকে অপয়া কাজের বুয়া হিসেবে তাকে ঐদিন অগ্রিম কাজ করা থেকে অব্যাহতি দিয়েছিল। লোকবিশ্বাসের এ চিত্র লৌকিক জীবনে এভাবে বিশ্বাসপরায়ণ হয়ে আছে। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে আজ আমরা অনেক আচার-আচরণকে কুসংস্কার বলছি। কিন্তু একদিন ছিল যখন এগুলো ধর্মকর্ম ও ধর্মবিশ্বাসের ন্যায় সকলের কাছে ছিল শ্রদ্ধার সামগ্রী।[৩৫] তবে একথা সত্য যে, প্রাচীনকালের বহুবিশ্বাস ও সংস্কার এখনো লোকজীবনে জীবন্তভাবে ক্রিয়াশীল রয়েছে।

আধুনিক একবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক সমৃদ্ধ প্রযুক্তিনির্ভর যুগেও লোকবিশ্বাসের দিক থেকে দোয়া তাবিজ-এর ব্যবহার গ্রাম-বাংলায় বরাবরই আজো সমানভাবে প্রচলিত আছে। উপন্যাসে দেখা যায় দোয়া-তাবিজের হেকমতকে প্রভাবিত করে উদ্দেশ্য হাসিল করার প্রচেষ্টা গৃহীত হয়েছে। উপন্যাসের ভাষায়-

> কামরুদ্দিনের টাকা খেয়ে শাহ সাহেবের দোয়া পড়া তাবিজ হয়তো পুঁতে রেখেছে জুম্মানের মায়ের ঘরের সামনে। একবার উঠে দেখবে? না, দাঁড়াবার মতো বল নাই বলে মাটি খুঁড়ে তাবিজ খোজার কাজ স্থগিত রাখে। এখন তাকে বিয়ে করতে কামরুদ্দিনের তো কেনো অসুবিধা হবে না। বিয়ের দিনই সে জিজ্ঞেস করবে, জুম্মনের বাপ ঈমানে কওতো, আমার প্যাট খসাইবার লাইগা বজলুর বৌরে দিয়ে তুমি আমার ঘরের বগলে তাবিজ পোতাইয়া রাখছিলা না।[৩৬]

স্বার্থসিদ্ধির জন্য দোয়া তাবিজের বরকতে মানুষ লোকজীবনে তার নিজের কার্য উদ্ধারের প্রচেষ্টা চালায়। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বহু মানুষ বর্তমানেও কোনো কাজের ফলাফল লাভের আশায় দোয়া তাবিজ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রতঙ্গে বিশ্বাসের সাথে বেঁধে রাখে। যার মধ্য দিয়ে সে তার বিশ্বাসের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। গ্রামাঞ্চলে লোকবিশ্বাসের প্রয়োগ ক্ষেত্রগুলো স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী স্বতন্ত্র। প্রয়োজন মনে করে লোকসমাজ এসব ব্যবস্থার আশ্রয় নেয়। এভাবেই উম্মোচিত হয় লোকবিশ্বাসের। এই উপন্যাসেও আমরা সে জাতীয় একটি বিশ্বাসের চিত্র দেখতে পাই করম আলি ও আনোয়ারের আলোচনায়। 'ঘোড়ার ডাক শুনেন নাই। নদীর মদ্যে কতো ঘোড়া ডাক পাড়ে শুনছেন ? আমাক ঠসা ঠাওরাস? তামাম নদীর মদ্যে ঘোড়া খালি তড়পাতিছে বিপদ দেখলে যমুনার ঘোড়া ডাকে'।[৩৭] আনোয়ার ও করম আলি এভাবে আসন্ন বিপদের নিশানার কথাকে স্মরণ করেছিল। ঘোড়ার ডাকের আওয়াজকে সংস্কার হিসেবে তারা বিশ্বাসের কাজে লাগায়। এ বিষয়ে সমালোচকের ধারণাও একই। 'সেখানে মানুষ নদীতে ঘোড়ার ডাক শুনতে পায়, সেখানকার পুরনো বাসিন্দা জীন গভীর রাতে উত্তরে উড়ে যায়। আর গ্রাম্যজন এই ইঙ্গিতসমূহে বিপর্যয়ের আভাস পায়। সেখানের মানুষ অদ্ভুত অদ্ভুত সব আঞ্চলিক প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহার করে, যার

মানে বোঝা বাইরের লোকের পক্ষে দুষ্কর।[৩৮] ঘোড়ার ডাকের প্রতিধ্বনি লৌকিক জীবনে এভাবে আজো বিশ্বস্ততা পেয়ে আসছে।

চিলেকোঠার সেপাই গ্রন্থে পল্লি জীবনের জীবন্ত ছবি ও পল্লি গ্রামের মানুষের উপকরণ সদৃশ বসবাসের জন্য লোকশিল্পের মতো নির্মিত ঘরবাড়ির পরিচয়ও বিধৃত হয়েছে। লোকশিল্প সাধারণ লোকের জন্যই এক ধরনের সাধারণ সৃষ্টি। বিত্তবানের সংগ্রহশালা কিংবা যাদুঘরে স্থান পাবার উদ্দেশ্যে তা তৈরি নয়। সাধারণ উপকরণে তৈরি এ শিল্প সামগ্রী সর্বসাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য, ফলে তার আবেদন সহজ ও সহজলভ্য।[৩৯] এমন সহজলভ্য উপাদানে তৈরি বসতবাড়ির পরিচয়ও উপন্যাসে বর্ণিত। ঘরের এক কোণে কলাপাতার বেড়া[৪০] আবার অন্যদিকে খড় দ্বারা নির্মিত ঘরের ওয়াল[৪১] সদৃশ বাড়িতে থাকে বাস্তুহারা নাদু পরামাণিক ও চেংটু। এটিই তাদের আশ্রয়স্থল। প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজন এভাবে স্বনির্মিত নির্মাণে তারা নির্মাণ করে হস্তশিল্পের এই কুটির। বাংলার প্রথাগত লোকশিল্পর ঐতিহ্য বহনকারী যেসব শিল্পবস্তুর প্রাণবন্ত প্রকাশ ঘটেছে, তারমধ্যে লোকশিল্প অন্যতম। হেলাফেলার যেসব বস্তু লোকশিল্পীদের হাতের নির্মাণে শিল্পবস্তুতে পরিণত হয়, তারই একটি উজ্জ্বল নিদর্শন হলো পায়ের খড়ম। গ্রাম বাংলায় তা আজো অনন্য গৌরবের অধিকারী হয়ে আছে। *চিলেকোঠার সেপাই* উপন্যাসে এ চিত্রের ব্যবহারও বহুমাত্রিকতা পেয়েছে। 'বড় মিয়া কাঠের খড়ম পরা পা দিয়ে নাদুর পিঠে এ্যায়সা এক লাথি দিয়েছিলো যে মাস দুয়েক সে আর পিঠ তুলতে পারেনি'।[৪২] লোকশিল্পের ব্যবহার লৌকিক জীবনের গ্রামীণ সমাজে এভাবে উৎকর্ষতা পেয়েছে। কাঠখোদাই শিল্পটি নিতান্তই লৌকিক, লোকসংস্কৃতির অঙ্গনে ফোটা শিউলী।[৪৩] গ্রামীণ লোক উপাদানের বস্তু হিসেবে নির্মিত কাঠের হুকার বর্ণনাও উপন্যাসে সংযোজিত হয়েছে। 'কাঁঠাল তলায় কাঠের বেঞ্চ। বেঞ্চের পাশে মাটিতে হাটু ভেঙ্গে বসে নাদু পরামানিক হুঁকা টানছিল। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় তার দাড়ি আরো এবড়ো থেবড়ো এবং এলোমেলো হয়ে গেছে। ওদের দু'জনের দিকে একবার তাকিয়ে সে ফের হুঁকা টানে এবং বেশি ধোঁয়া গলগল করে বেরিয়ে ওর মুখকে ক্রমে অস্পষ্ট ও নির্বিকার করে ফেলে'।[৪৪] এ থেকে অনুমান করা যায় যে, লোকজ উপাদানের ক্ষেত্র উপন্যাসে ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়ে আছে। ঐতিহ্যচেতনা ও লোকঐতিহ্যের প্রকাশ ঘটানো গ্রামবাংলার একটি চিরাচরিত কালচার। উপন্যাসে সামন্ত পরিবারের ঐতিহ্যের প্রকাশ হিসেবে দেখা যায়, বাড়ির বাইরে অবস্থিত বৈঠকখানার কারুকার্য। 'আনোয়ারের দাদাজি মারা যাওয়ার তিন বছর আগে এই বৈঠকখানার দালানে চিড় ধরেছে। নতুন করে তৈরি করার জন্য গোটা দালান ভেঙ্গে ফেলা হয়'।[৪৫] ঐতিহ্যবাহী সামন্ত পরিবারগুলো আজ যে বিলিন হবার পথে, সে চিত্রেরই কথা জানা যায় সামন্ত পরিবারের বাড়ির সামনে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী ফাটল ধরা বৈঠকখানার চিত্র দেখে। পুরাতন স্মৃতিস্তম্ভ এভাবেই ইতিহাস ঐতিহ্যের গোপন কথা গ্রামীণ জীবনে ফুটে উঠেছে। ইলিয়াস তাঁর উপন্যাসে অসংখ্য গ্রামীণ লোকজ উপাদানের ব্যবহারে লৌকিক জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যতা দিয়েছেন। 'বিকাল বেলা নবেজউদ্দিন কাঁথা গায়ে শুয়েছিল। ঘরের ভেতর মাচার উপর'।[৪৬] আবার উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র করমালিকে দেখা যায় বাঁশের চাটাই হাতে[৪৭] বাড়ি থেকে বের হয়ে আসছে। লোকজ উপাদানে সমৃদ্ধ *চিলেকোঠার সেপাই* উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে গ্রামীণ জীবনের কার্য তালিকায় ব্যবহৃত নানা

চিত্রের সমাহার। ইলিয়াসের এ গ্রন্থে গ্রামীণ জীবন ও মাটির সঙ্গে লৌকিক উপাদানের সৃজনশীল সংযোগ স্থাপন ও সংযোগ রক্ষা সীমাহীনভাবে তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের অসাধারণ রচনা *চিলেকোঠার সেপাই*-এ লৌকিক জীবনের অসংখ্য উপাদান গ্রামীণ পটভূমিতে বৈচিত্র্যময়তা এনে দিয়েছে। এর চিত্র হিসেবে দেখা যায় লোকপ্রযুক্তির আবিষ্কার স্বরূপ ঘোড়ার গাড়ির বিবরণ। 'ঘোড়ার গাড়ি করে কবীরের মা আবার কখন এসে পড়ে'।[৪৮] ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে-'লোকবিজ্ঞানের একটি প্রধান শাখা হলো হস্তশিল্প'।[৪৯] এক সময়ের প্রধান যানবাহন ছিল গোড়ার গাড়ি যা লোক কর্তৃক নির্মিত এক প্রকার যানবাহন। গ্রামীণ লোকসমাজের সকল স্তরের মানুষের যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম ছিল এই ঘোড়ার গাড়ি। তবে আজকের বিজ্ঞানের যুগে এর আবেদন হ্রাস পেলেও গ্রাম ও শহরে এখনো এই যানবাহনের ব্যবহার রয়েছে। এ গ্রন্থের বিষয়বস্তুতে মূলত প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামীণ লৌকিক জীবনের সমাজবাস্তবতাকে তুলে ধরা হয়েছে, বাস্তবতার নিরিখে গ্রামীণ লোকসমাজকে বিভিন্ন সময় প্রয়োজনের তাগিদে বিভিন্ন রকম খাদ্য-খাবার খেতে হতো। খাওয়া-দাওয়া এবং রান্নার প্রণালী বিভিন্ন দেশে এমনকি একই দেশের নানা সমাজে তা স্বতন্ত্র। এ উপন্যাসেও এমন লোকাচারের ব্যবহার শাস্ত্রসম্মতভাবে সংযোজিত হয়েছে। 'জালাল মাস্টার এখন নীরব। দুধ দিয়ে কলা দিয়ে গুড়া দিয়ে ভাত মাখার কাজে সে একাগ্রচিত্ত'।[৫০] গ্রামীণ লোকসমাজ আধুনিক রান্নায় সমৃদ্ধ রেস্টুরেন্ট বহির্ভূত খাবারের পরিবর্তে গ্রামীণ লোকখাদ্য সদৃশ খাবার খেতে একান্তই অভ্যস্ত। কোন বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠানে গ্রামীণ সমাজে ঘটা করে আটা কোটা ও পিঠা তৈরি করে খাবার যে বর্ণনা, আবহমান বাংলার যে ঐতিহ্য উপন্যাসে তা স্থান পেয়েছে। নাদু পরামাণিকের ছেলে চেংটু পাশের বাড়িতে পিঠা খাবার দাওয়াত পেয়েছিল, কিন্তু তৃপ্তি সহকারে না খেতে পাওয়ায় সে তার মাকে এসে বলেছিল-'ও মা আলোচাল কেটোতো! ভাপাপিঠা করো, আনোয়ার ভায়েক পিঠা খাওয়ামু'।[৫১] অভাবী সংসারের ছেলে-মেয়েরা এভাবেই মায়ের কাছে খাবার জন্য আবেদন জানায় ও বায়না ধরে। ঔপন্যাসিক গ্রামীণজীবন চিত্রের বর্ণনা এভাবেই উপন্যাসে সত্যসত্যভাবে সন্নিবেশিত করেছেন।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *চিলেকোঠার সেপাই* গ্রন্থে জন্মপূর্ব গ্রামীণ লৌকিক ক্রীড়ার বর্ণনাও বিস্তর পরিচয়ে ধৃত হয়েছে। লোকক্রীড়াগুলো আবহমান বাংলার অধিবাসীদের সংস্কৃতির একটি বলিষ্ঠ ধারা। লোকক্রীড়া চিত্তবিনোদনের বহুবিধ উপায়ের অন্যতম। জাতির উৎসাহ উদ্দীপনা শৌর্য ও সাহসিকতার পরিচয় খেলাধুলার মাধ্যমে উন্মোচিত হয়। উপন্যাসে শিশুদের এ জাতীয় খেলা খেলতে দেখা যায়। 'ছোট ছোট পিচ্ছিরা ডাংগুলি খেলছে'।[৫২] ডাংগুলি খেলা হয়তো তেমনি কোন পূর্ব প্রচলিত আচারের অনুকরণ। অঞ্চলভেদে এ খেলার রীতি ও গণনার সংখ্যা এমন এঁড়ি, দুড়ি, তেঁড়ি, চুড়ি, চম্পা, ঝেট্, ঝান্'।[৫৩] স্বভাবতই উপলব্ধি হয় খেলাটি একান্তভাবে লৌকিক উপাদানে সমৃদ্ধ। আবার লোকসংস্কৃতির অংশবিশেষ গ্রামীণ লোকনাট্যের আসরও উপন্যাসে স্থান করে নিয়েছে। 'সিরাজগঞ্জের নামকরা অপেরা পার্টি। চন্দনদহের নতুন কলেজের ফান্ড তৈরির জন্য সিরাজউদ্দৌলা পালার আয়োজন। ঐ অপেরা পার্টির আরো ভালো ভালো পালা আছে, কিন্তু কলেজের সাহায্যে টাকা তোলা হচ্ছে; কারণ সে বই হলে চলে না। স্কুলের মাঠে প্যান্ডেল

করে যাত্রা, চারদিকে বাঁশের বেড়া। সামিয়ানার নিচে চাটাই পেতে খড় বিছানো রয়েছে; মঞ্চের সামনে তিন সারি চেয়ার'।[৫৪] লোকনাটক বাংলার লোকসমাজ কর্তৃক রচিত হয়ে থাকে। লোকসমাজের মধ্যে প্রচলিত বিষয় বা যেসব ঘটনা সম্পর্কে লোকসমাজ অবহিত এমন বিষয়বস্তু লোক শিল্পীগণ গ্রহণ করে থাকেন। এমন বিষয়বস্তুকে লোকনাট্যের শিল্পীগণ সমবেত প্রচেষ্টায় নাট্যরূপ দেন। ইলিয়াস সে সংস্কৃতির কথাও বলেছেন উপন্যাসটিতে। লোকসমাজ কর্তৃক লোকভাষায় অভিনীত লোকসমাজের পৃষ্ঠপোষকতায় লোকবেষ্টিত আসরে পরিবেশিত স্বল্প চরিত্র ও নৃত্য-গীত-বাদ্য সমন্বিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও শাস্ত্র নিরপেক্ষ ঐতিহ্যানুযায়ী বিষয়, অঙ্গসজ্জা, অভিনয়, রীতি প্রকরণাদি অনুবর্তিত বা কালানুক্রমে পরিবর্তিত হয়ে স্বতঃস্ফূর্ত ধারায় লোকজীবন ও লোকমনকে প্রতিভাসিত করে যে দৃশ্যকলা তাই লোকনাট্য।[৫৫] এ ধারাও যথাযথভাবে *চিলেকোঠার সেপাই*-এ বিধৃত হয়েছে।

বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যের ইতিহাসে আধুনিক ও স্বতন্ত্র ধারার উপন্যাস *চিলেকোঠার সেপাই*-এ কাহিনী কিংবদন্তি ও লোকজীবনের ইতিহাস-ঐতিহ্য একইসঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে। উপন্যাসে বর্ণিত 'ছোট থাকতে দাদার কাছে শুনেছি চান্দের পয়লা সাতদিনের মদ্যে বৈরাগীর ভিটার বট বিরিক্ষের এই পুরানা বাসেন্দা উত্তরের মুখে উড়াল দিলে গাঁয়ের মানুষ ভয়ে সিটকা নাগছে, বড় লোকেরা মিলাদ দিচ্ছে, মানত করছে। জুম্মার ঘরত নফল নামাজ পড়ছে'।[৫৬] বংশ পরম্পরায় এভাবেই বৈরাগীর ভিটার কিংবদন্তি লোকজীবনকে প্রভাবিত করেছিল। মুরুব্বি জালাল মাস্টার আধুনিক প্রজন্মের প্রতিভূ আনোয়ারকে জানায়-'তোমরা বাপু আজ কালকার শিক্ষিত চ্যাংড়াপ্যাংড়া সবই ন্যাংটো করা দেখবার চাও। মুরুব্বি মানো না। ...কেউ এই গাছের ডাল কাটলে কি দেহের কোনো জায়গায় কোপ দিলে সেই মানুষের অকল্যাণ ঘটে। তার ক্ষতি একটা না একটা হবেই! সত্যি'।[৫৭] জালাল মাস্টার আনোয়ারকে আরো জানায়, 'যদি কেহ এর ডালে কুড়ালের কোপ দেয় তাহলে সেই মানুষ রক্তবমি করতে করতে মরবে। না হলে মাথাত বায়ু চড়ে, তখন নিজেই গলাত দড়ি দিয়া মরে'।[৫৮] অনুরূপ একই কথা নাদু পরামানিক তার সন্তান চেংটুকে বারবার স্মরণ করে অনুনয় করছিলো। 'হ্যামগোরে দ্যাখ্যা ঘটনা বাবা এই গাছত যাঁই একোটা কোপ মারছে মুখত তাঁই আর ভাতের একটা নলাও তুলবার পারে নাই গো। অক্তবমি করতে করতে সিটক্যা মরছে'।[৫৯] উপন্যাসে বর্ণিত বৈরাগীর ভিটার অলৌকিক মোজেজার কথা উপন্যাসের প্রায় সব চরিত্রেই কমবেশি প্রকাশ পেয়েছে। উপন্যাসের বেশির ভাগ লোক এই ভিটার পুরনো বাসিন্দার কথা শুনলে আৎকে উঠে। ঔপন্যাসিক *চিলেকোঠার সেপাই*-এ বৈরাগীর ভিটা, প্রাচীন বটগাছ, যমুনায় ঘোড়ার ডাক প্রভৃতি সংস্কার ও কিংবদন্তি ঘিরে গ্রামীণ জীবন যাপনের এক লোকবিশ্বাস তুলে ধরেছেন।[৬০] প্রাত্যহিক জীবন যাপনের মধ্যে লোকউপাদানের ব্যবহারিক আবিষ্কার যে বৈচিত্র্যময় আনন্দ দেয় সে চিত্রই তিনি সতত অভিজ্ঞতায় নতুন আঙ্গিকে সাহিত্যমোদীদের কাছে তুলে ধরেছেন।

ইলিয়াসের প্রথম উপন্যাস *চিলেকোঠার সেপাই*-এ লোকসংস্কৃতির অংশ বিশেষ হিসেবে প্রবাদ-প্রবচনের মাধ্যমে জাতির সভ্যতা-সংস্কৃতির ইতিহাসকে তুলে ধরা হয়েছে। প্রবাদ এর স্রষ্টা সাধারণ মানুষ। সাধারণ বুদ্ধির বহুদর্শিতায় প্রবাদ এর সৃষ্টি ও প্রচলন। যে বচন

ছিল পিতার, কালক্রমে তা পেল পুত্র, এভাবে গ্রামের মোড়ল পর্যন্ত এসে আপ্তবাক্যে তা পরিণত হয়।[৬১] মানব জীবনের অভিজ্ঞতা এভাবে বর্ণিত হয়েছে-'যার খায় যার পরে, তারেই ধইরা হোগা মারে'।[৬২] এখানে লৌকিক জীবনে বর্ণিত বিশ্বাস ঘাতকতার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। বাঙালি যে মিরজাফরের বংশ সে কথায় এখানে বিম্বিত হয়েছে। আবার 'পুরানা চাল ভাতে বাড়ে'[৬৩] প্রবাদটির মাধ্যমে ইতিহাস-ঐতিহ্য প্রীতির কথাও ব্যক্ত হয়েছে। যে কোনো মানুষ মাত্রই লোকসমাজে তাঁর পুরাতন ঐতিহ্যের কথাকে দাম্ভিক্যের সঙ্গে বলতে চায় বা প্রকাশ করতে চায়, সে চিত্রই এখানে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। অনুরূপভাবে 'কতো ধানে কত চাল'[৬৪] কথাটির মধ্যে রয়েছে গ্রামীণ লোকসমাজের মধ্যে প্রচলিত এক ধরনের বাহুবল্যের কথা। প্রবাদ-প্রবচনের মাধ্যমে বাংলার জীবনচিত্রের কথা ইলিয়াস তার গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। অতীতের মনস্তত্ত্ব এবং ইতিহাসকে তুলে ধরার কাজ করে প্রবাদ।[৬৫] এজন্য প্রবাদে সমাজজীবনের যে চিত্র পাওয়া যায়, তা যেমন বাস্তব, তেমনই প্রত্যক্ষ। প্রবাদের মাধ্যমে জীবনের চরম সত্যকথা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে প্রকাশ পায়। এসব বিষয়ের অবতারণা *চিলেকোঠার সেপাই* উপন্যাসে একান্তভাবে বর্ণিত হয়ে বাংলার লৌকিক জীবনকে সমগ্রতা দিয়েছে।

জীবন যাপনের ক্ষেত্রে মানুষ স্বভাবতই ঐতিহ্য অনুসন্ধানী। প্রাচীনকালের ঐতিহ্য থেকে শুরু করে আজকের একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত গ্রাম্য সাহিত্যের অনেক লোকজ ও আঞ্চলিক শব্দসহ গ্রামীণ লোকউপাদান জাতীয় শব্দ ঐতিহ্যগতভাবে সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় ঐতিহ্যের মাধ্যমে লোকজ উপাদানের সৃষ্টি হয়েছে। ইলিয়াসের *চিলেকোঠার সেপাই* উপন্যাসে আমরা এসব লোকজ উপাদানের সঙ্গে লৌকিক আমেজ মিশ্রিত আঞ্চলিক শব্দের অসংখ্য ব্যবহার প্রত্যক্ষ করি। লোকজীবনের ঐতিহ্য ও লৌকিক জীবনাচারের অনুষঙ্গ হিসেবে নানা শব্দাবলির পরিচয় পাওয়া যায় *চিলেকোঠার সেপাই* উপন্যাসে। আর সেগুলো হলো-পোয়াতি, আদি নেওয়া, জমির আল, ভিটা, ধান, পাট, কালাই, বাঁশের খুঁটি, নারিকেলের তেলরাখা কাঠের টুকরা, রুটিবেলার বেলুন, পিঁড়ি, খিয়ার অঞ্চল, বলকানো, ভিটামাটি, বাঁশের ডাং, আছেলা বাঁশ, বাঁশের খাচা, কাঠের বেঞ্চ, হাউস, বাঁশের রেলিং, বউ, গাঁওত, একঘড়ি এনা, হামি শুতমু, তামান আত, নিন্দ পাড়া, ক্যামকা ঠেকে, হাউস হওয়া, হামাক এ্যানা, পা হড়কে যাওয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

চিলেকোঠার সেপাই এ বাস্তবজীবনার্থের নৈপুণ্যে গ্রামীণ লোকজ উপাদানসহ লৌকিক জীবনের নানা চিত্র শৈল্পিক অভিপ্সায় উপন্যাসের মর্যাদা পেয়েছে। তিনি সময়-সমাজ-সভ্যতা, ইতিহাস, বিশ্বাস ও ঐতিহ্যকে জ্ঞানলব্ধ ছকের মাধ্যমে উপন্যাসে নুতন শিল্পমাত্রায় উন্নীত করেছেন। লেখক তাঁর এই উপন্যাসে বগুড়া জেলা ও তৎসলগ্ন গ্রামীণ জীবন, সেখানকার মাটি ও মানুষের বিশ্বাস-সংস্কার, কিংবদন্তি, আলুরখেত, পাখ-পাখালি, করতোয়া নদী ও মাজার[৬৬] প্রভৃতি দৃশ্যপটের লৌকিক বর্ণনা শিল্পায়ণে রূপ দিয়েছেন। সে

কারণেই বলা যায় *চিলেকোঠার সেপাই* গ্রামীণ মধ্যবিত্তের দোদুল্যমান জীবনের রূপায়িত আলেখ্য।

তথ্যসূচি:

---

১ আনু মুহাম্মদ, ঊনসত্তরের অভ্যুত্থান এবং আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের চিলেকোঠার সেপাই, মজিবুল হক কবীর ও মাহবুব কামরান(সম্পাদিত) *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস স্মারকগ্রন্থ* (ঢাকা: ম্যাগনাম ওপাস-২০০০), পৃ. ৮৭

২ রফিকউল্লাহ খান, *কথাসাহিত্যের বিচিত্র বিষয় ও নন্দনতত্ত্ব* (ঢাকা: অনন্যা-২০০০), পৃ. ৮৬

৩ *তদেব*, পৃ. ১৩১

৪ খালিকুজ্জামান ইলিয়াস-সম্পাদিত, *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনাসমগ্র-২* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স-২০০২), পৃ. ১৪

৫ *তদেব*, পৃ. ৫৪

৬ *তদেব*, পৃ. ৫৬

৭ *তদেব*, পৃ. ৫৬

৮ *তদেব*, পৃ. ৫৭

৯ *তদেব*, পৃ. ৫৭-৫৮

১০ *তদেব*, পৃ. ৫৮

১১ শান্তনু কায়সার, স্বপ্ন বৃত্তান্ত ও তার ব্যাখ্যা, *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস স্মারকগ্রন্থ* (কলকাতা: অমৃত লোকসাহিত্য পরিষদ, ১৯৯৭), পৃ. ১৩৫

১২ খালিকুজ্জামান ইলিয়াস-সম্পাদিত, *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনাসমগ্র-২*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

১৩ *তদেব*, পৃ. ১১৫

১৪ অজয় রায়, *বাঙলা ও বাঙালী* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি-১৯৭৭), পৃ. ১৪৩

১৫ খালিকুজ্জামান ইলিয়াস-সম্পাদিত, *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনাসমগ্র-২*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫

১৬ *তদেব*, পৃ. ১৩৫

১৭ *তদেব*, পৃ. ১৩৫

১৮ ওয়াকিল আহমদ, *বাংলার লোকসংস্কৃতি* (ঢাকা: গতিধারা, ২য় প্রকাশ-২০০১), পৃ. ২৪৪

১৯ খালিকুজ্জামান ইলিয়াস-সম্পাদিত, *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনাসমগ্র-২*, পৃ. ১১৬

২০ *তদেব*, পৃ. ১১৬

২১ *তদেব*, পৃ. ৩০৪

২২ মুজিবুল হক ও মাহবুব কামরান-সম্পাদিত, *আখতারুজজামান ইলিয়াস স্মারকগ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩

২৩ খালিকুজ্জামান ইলিয়াস-সম্পাদিত, *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনাসমগ্র-২*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬

২৪ শহীদ ইকবাল, *কথাশিল্পী আখতারুজ্জামান ইলিয়াস* (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন-১৯৯৭), পৃ. ১০৭

২৫ খালিকুজ্জামান ইলিয়াস-সম্পাদিত, *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনাসমগ্র-২*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৭

২৬ *তদেব*, পৃ. ৩০০

২৭ আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোকসাহিত্য-১ম খণ্ড* (কলকাতা: ক্যালকাটা বুক হাউজ, ৩য় সংস্করণ-১৯৬২), পৃ. ৪৬৬

২৮ খালিকুজ্জামান ইলিয়াস-সম্পাদিত, *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনাসমগ্র*-২, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১
২৯ *তদেব*, পৃ. ১১১
৩০ *তদেব*, পৃ. ১১১
৩১ E.Thorstorn Omens and superstitions of Southern India. (New York: Me Bridge Nast Co.1912), p. 2
৩২ *তদেব*, পৃ. ২৯৩-২৯৪
৩৩ *তদেব*, পৃ. ২৯৩-২৯৪।
৩৪ *তদেব*, পৃ. ২৯৬
৩৫ ড. আশরাফ সিদ্দিকী, *লোকসাহিত্য*-১*ম খণ্ড* (ঢাকা: মুক্তধারা-১৯৬৩), পৃ. ১৮
৩৬ খালিকুজ্জামান ইলিয়াস-সম্পাদিত, *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনাসমগ্র*-২, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬
৩৭ *তদেব*, পৃ. ২০৭
৩৮ মজিবুল হক কবীর ও মাহবুব কামরান-সম্পাদিত, *আখতারুজজামান ইলিয়াস স্মারক গ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫
৩৯ তোফায়েল আহমদ, *লোকশিল্প প্রসঙ্গে*, সনৎকুমার মিত্র(সম্পাদিত), লোকসংস্কৃতি গবেষণা (কলকাতা: লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ-১৪০৬), পৃ. ৫৪
৪০ খালিকুজ্জামান ইলিয়াস-সম্পাদিত, *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনাসমগ্র*-২, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮
৪১ *তদেব*, পৃ. ১১৮
৪২ *তদেব*, পৃ. ১১৫
৪৩ শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী ও সজনীকান্ত দাস, *আধুনিক কাঠখোদাই চিত্র*, সনৎকুমার মিত্র (সম্পাদিত) (কলকাতা: লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ-১৪০৬), পৃ. ২৮৭
৪৪ খালিকুজ্জামান ইলিয়াস-সম্পাদিত, *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনাসমগ্র*-২, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪
৪৫ *তদেব*, পৃ. ১১৭
৪৬ *তদেব*, পৃ. ১৩৭
৪৭ *তদেব*, পৃ. ১৩৩
৪৮ খালিকুজ্জামান ইলিয়াস-সম্পাদিত, *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনাসমগ্র*-২, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭
৪৯ ড. আশরাফ সিদ্দিকী, *লোকসাহিত্য*-১মখণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭
৫০ খালিকুজ্জামান ইলিয়াস-সম্পাদিত, *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনাসমগ্র*-২, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮
৫১ *তদেব*, পৃ. ২৯৪
৫২ অসীম দাস, *বাংলার লৌকিক ক্রীড়ার সামাজিক উৎস* (কলকাতা: পুস্তক বিপণি-১৯৯১), পৃ. ২৬
৫৩ খালিকুজ্জামান ইলিয়াস-সম্পাদিত, *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনাসমগ্র*-২, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬
৫৪ সঞ্জীব নাথ, *বাংলার লোকনাট্য স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য* (কলতাতা : অর্পনা বুক ডিস্টিবিউটার্স-২০০৩), পৃ. ৬
৫৫ খালিকুজ্জামান ইলিয়াস-সম্পাদিত, *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনাসমগ্র*-২, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪
৫৬ *তদেব*, পৃ. ১৪৭
৫৭ *তদেব*, পৃ. ১৪৭
৫৮ *তদেব*, পৃ. ২৬১
৫৯ *তদেব*, পৃ. ২১৬
৬০ মুজিবুল হক ও মাহবুব কামরান-সম্পাদিত, *আখতারুজজামান ইলিয়াস স্মারকগ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩
৬১ সুশীল কুমার-সম্পাদিত, *বাংলা প্রবাদ* (কলকাতা: এ মুখার্জী এন্ড কো. লিমিটেড-১৩৫৯), পৃ. ২
৬২ খালিকুজ্জামান ইলিয়াস-সম্পাদিত, *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনাসমগ্র*-২, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২

[৬৩] *তদেব*, পৃ. ২৩৭

[৬৪] *তদেব*, পৃ. ৩২০

[৬৫] আশরাফ সিদ্দিকী, *লোকসাহিত্য-১ম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

[৬৬] প্রদীপন দাসগুপ্ত, ইলিয়াস ভাই: শেকড়ের খোঁজে, সমীরণ মজুমদার-সম্পাদিত, *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস স্মারকগ্রন্থ* (কলকাতা: অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ-১৯৯৭), পৃ. ১৮৩